OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 786 - 792
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সাহিত্যের আলোকে পশ্চিমবঙ্গে নারীশিক্ষা (১৯৪৭-২০১১) : কয়েকটি সূত্র

ড. সমীর মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, নাকাশিপাড়া
Email ID : samirmandalchak@gmil.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Women, higher education, West Bengal, literature, college, condition, politics, struggle.

Abstract
Today access to education is offered to people from all strata of society in West Bengal. Both the union government and the state government took up the development and expansion of women's education at all stages as a special scheme since independence. I will attempt to show the conditions of women in higher education in West Bengal as reflected in Bengali literatures. The picture of higher education of women is reflected in contemporary Bangla literature. We know that literature is the reflection of human activities. We can cite some important contemporary novels to understand how higher education of women is highlighted. These novels show us the status of women in higher education in West Bengal. The memoir Sreesadaner Sreematira, written by Reeta Basu, is the reflection of the school hostel of girls, established by Rabindranath Tagore in Santiniketan. We can understand the mentality of the parents of women as well as women's education at the time of 1960s and 1970s from her writings. The novel Ekushe Pa, written by Bani Basu, is the story of West Bengal during 1980s and 1990s. The author told the story of a band of youth, who entered the college for undergraduate studies at the age of eighteen years and graduated at the age of twenty one years. Even, after marriage the situation worsened. Bani Basu in another novel, Amrita, portrayed the situation. We can discuss another novel, in where we find another picture of the presence of women in higher education scenario of the state. The novel Jalchhabi written by Suchitra Bhattacharya is the reflection of the college education and struggle of women who had achieved service in schools by the School Service Commission. The novelist showed the complexities of continuing domestic duties and works of public domain, which women had to face. We would also see that the people gradually understood the benefits of higher education. Hence more girls' students were engaged in higher education day after day. The enrolment of students including girls' students was rising step by step.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বর্তমানে সমগ্র ভারতের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বিশেষত নারী শিক্ষার বেশ অগ্রগতি ঘটেছে। তবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পূর্বে এ দেশে নারী শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটেছে। বলা হয়, সমাজ জীবনের দর্পণ হল সাহিত্য। পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার প্রতিফলন সাহিত্যের মধ্যেও ঘটেছে। এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করবো মূলত সাহিত্যের আলোকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষা। এই পর্বে বহু সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যেগুলি নারীদের শিক্ষা সম্পর্কিত। তবে এই স্বল্প পরিসরে এবং আলোচনার সুবিধার জন্য কিছু সাহিত্য নির্বাচিত হয়েছে। এই সাহিত্যগুলিতে নারী শিক্ষা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা দেখানোর চেষ্টা করবো। প্রসঙ্গত প্রামাণিক তথ্য হিসাবে কিছু সরকারি নথির সাহায্য নিয়েছি। এই আলোচনায় নারী শিক্ষা প্রসারের প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবস্থান, সাফল্য প্রভৃতি দিক দেখানোর চেষ্টা করবো।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এদেশে নারী শিক্ষার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। ঔপনিবেশিক সরকার নারী শিক্ষার বিষয়ে প্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের 'উডের ডেসপ্যাচ'-এ। এই পর্বে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখের উদ্যোগে নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এই পর্বের নারী শিক্ষার চিত্র উপলব্ধি করা যায় শ্রীমতী রাসসুন্দরীর *আমার জীবন* থেকে।[১] এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেন, *আমার জীবন* শুধুমাত্র শ্রীমতী রাসসুন্দরীর নয়, সে কালের অনেক নারীর জীবনের চিত্র এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। সে কালে গ্রাম্য নারীদের ভয়, লজ্জা ও সামাজিক সংস্কার কিভাবে প্রকাশ পেত, তা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই গ্রন্থে শ্রীমতী রাসসুন্দরী বলেছেন যে, ১২১৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন, সে সময় একজন নারীকে পরিবারে পাঁচটি ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে হত – কন্যা, বোন, ননদ, পুত্রবধূ এবং গৃহকত্রী হিসাবে।[২] তিনি বলেছেন, বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রথম মা হয়েছিলেন। তিনি ১০ পুত্র এবং ২ কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের যখন জন্ম দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪১ বছর।[৩] তিনি দেখিয়েছেন যে সে সময় পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনাকে অবহেলা করা হত। কোন মেয়ের হাতে পড়াশোনার লক্ষ্যে এক টুকরো কাগজ দেখলেই পরিবারের অন্যেরা, বিশেষত বয়স্ক মহিলারা, ভীষণ আপত্তি জানাতো। তিনি লিখেছেন যে *চৈতন্যভাগবত* পড়ার তীব্র আকাঙ্খা তাঁকে তাঁকে পড়াশোনা শিখতে আগ্রহী করেছিল।[৪] সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে সময় কয়েকজন নারী আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮৬১-১৯২৩) এবং চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারী হিসাবে প্রথম স্নাতক হয়েছিলেন। তবে কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে পরবর্তীকালে মেডিক্যাল পড়ার সময় রক্ষণশীল সমাজের তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন (মতান্তরে ২৩শে জুন) কাদম্বিনী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন।[৫] কিন্তু তাঁর মেডিক্যাল পড়ার তীব্র বিরোধী এই কলেজের প্রবল রক্ষণশীল চিকিৎসক রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র মেডিসিন পেপারে মৌখিক পরীক্ষায় এক নম্বরের জন্য কাদম্বিনীকে ফেল করিয়ে দেন।[৬] এরপর 'লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি' পড়ার পর ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি আবার তাঁর বিষয়ে কাদম্বিনীকে ফেল করিয়ে দেন।[৭] এরপর কাদম্বিনী বিলাতে গিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁর কাঙ্খিত এল আর সি পি, এল আর সি এস এবং এল এফ পি সি ডিগ্রি অর্জন করেন।[৮] এইভাবে তিনি সেই সময়ের রক্ষণশীল সমাজের সমস্ত উপেক্ষার জবাব দিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে যান এবং প্রমাণ করেন যে আন্তরিক ইচ্ছা ও অদম্য প্রচেষ্টা থাকলে যে কোন লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

এইভাবে বাংলায় কয়েকজন 'নব্য নারী'র আবির্ভাব ঘটে, যারা শিক্ষা প্রসার ও সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। এই সকল নারীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), লেডি অবলা বসু (১৮৬৫-১৯৫১), পন্ডিতা রমাবাঈ (১৮৫৮-১৯২২) প্রমুখ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার সময় পশ্চিমবঙ্গে মোট জেনারেল ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৫। এই কলেজগুলিতে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৩৬২৩২ জন। এরমধ্যে নারী শিক্ষার্থী ছিল ৩৭৯৯ জন।[৯] স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে নারী শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

এই পর্বে নারী শিক্ষার প্রতিফলন কয়েকটি সাহিত্যে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়ে ঋতা বসুর *শ্রীসদনের শ্রীমতীরা* বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[১০] এখানে লেখিকা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮০৮-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের মেয়েদের স্কুল হোস্টেল, শ্রীসদনের, কথা বলেছেন। লেখিকা নিজে শ্রীসদনে আবাসিক হিসাবে এসেছিলেন। তিনি এখানে দেখিয়েছেন যে সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৬০-এর দশকে এবং ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবকদের লক্ষ্য ছিল বাড়ির মেয়েদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে দায় মুক্ত হওয়া।[১১] লেখিকা জানিয়েছেন যে সে সময়ে পারিবারিক কাঠামোয় ছেলে-মেয়েদের দিকে বাড়তি কোন মনোযোগ দেওয়াকে আদিখ্যেতা বলে মনে করা হত। অর্থাৎ বর্তমান পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে সে সময়ের তথা ১৯৬০-এর দশক এবং ১৯৭০-এর দশকের সমাজ জীবনে ছেলে-মেয়েদের অবস্থান বেশ আলাদা ছিল।

আবার সে সময় উত্তর কলকাতায় মেয়েদের বাড়ির বাইরে দেখলে মনে করা হত যে এই পৃথিবীতে তাদের মূল চাওয়া হল, এই বিপদসংকুল পরিবেশে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে নিরাপদে এবং অক্ষত অবস্থায় বাড়িতে আবার ফিরে আসা।[১২] অর্থাৎ মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়াটাকে সমাজ ভালোভাবে মেনে নিত না এবং তা নিরাপদও ছিল না।

শ্রীসদনের একটি ঘটনার কথা লেখিকা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে সে সময়ে সমাজের মানুষের মানসিকতা সাধারণভাবে কেমন ছিল। ঘটনাটি হল একদিন পিয়ালী ও মহুয়া নামে দুইজন আবাসিক শিস দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সে সময় সুমনা নামে অন্য একজন আবাসিক তাঁদের থামিয়ে দিয়ে জানায় যে তাঁরা যেন ভুলে না যায় যে তাঁরা মেয়ে হয়ে জন্মেছে। অর্থাৎ তাঁরা যেহেতু মেয়ে তাই তাঁরা শিস দিতে পারবে না।

আবার বাণী বসু তাঁর *একুশে পা* উপন্যাসে ১৮৮০-র দশক এবং ১৮৯০-এর দশকের শিক্ষা, বিশেষত নারীদের কলেজ জীবনের শিক্ষার চিত্র তুলে ধরেছেন।[১৩] এই উপন্যাসে উজ্জয়িনী, ইমন, মিঠু ঋতু, রাজেশ্বরী, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রমুখ মেয়েদের কথা লেখিকা বলেছেন, যারা ১৮ বছর বয়সে কলেজে ভর্তি হয় এবং ২১ বছর বয়সে পা দিয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব পড়ুয়াদের শুধুমাত্র শিক্ষার দিকটিই নয়, শিক্ষা লাভের অনেক নির্ধারক দিকগুলি অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, তাদের মানসিকতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, রুচি, তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন প্রভৃতি অসামান্য দক্ষতায় লেখিকা এখানে তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে একজন টেবল টেনিস খেলোয়াড় ইমন মুখারজী কলেজে নতুন ভর্তি হয়েছে। সে হোস্টেলে থাকে। সেখনে জলি দেবী নামে থার্ড ইয়ারের ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে ইমন জানতে পারে যে জলি দেবী বি এস সি পাশ করে আর এম এস সি পড়বে না। কারণ সে একটি টিচার্স ট্রেনিং কোর্স করে শিক্ষকতা করতে চায়। তারপর লজ্জায় গাল দুটো লাল করে বলে এরপর সে বিয়ে করতে চায়।[১৪] অর্থাৎ লেখিকা এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে সে সময় কলেজে পড়তে আসা অনেক মেয়েদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল বিবাহ করা।

তবে ইমন মুখারজীর স্বপ্ন এর থেকে আলাদা। তাঁর বাবা নেই, মা রানাঘাটের একটি হাসপাতালের আয়া, তাঁর ভাই শারীরিক প্রতিবন্ধী। তাই তাঁর জীবনে বহু দায়িত্ব – নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, ভাই-এর দেখাশোনা করা এবং মায়ের কষ্ট দূর করা।[১৫] তাই সে তাঁর কলেজের সহপাঠী মিঠুর প্রতিষ্ঠিত দাদা ও তাঁর পরিবারের কাছ থেকে বিবাহের উত্তম প্রস্তাব পেয়েও নিরুত্তর থাকে। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র নিজের সুখ নয়, তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধী ভাই এবং দুঃখী মায়ের জীবনে সুখ ও শান্তি নিয়ে আসাও। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের একাংশ নিজের জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির চেয়ে পরিবারের সুখ ও শান্তির প্রতি বেশি যত্নবান।

এই উপন্যাসে দেখা যাবে যে দুইজন কলেজের শিক্ষার্থী তন্ময় ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ে উভয়কে ভালোবাসে। তন্ময়ের মা একটি কলেজের প্রিন্সিপল। তিনি যেমন কলেজে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন, তেমনি বাড়িতে ফিরেও কলেজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। রান্না করার সুযোগ তিনি পান না। তাঁর বাড়িতে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তবে তাঁর বোন নিজে মেয়ে বলে বাড়ির কাজ করতে বেশি পছন্দ করে এবং বাইরের কাজ তাঁকে দিয়ে, অর্থাৎ তন্ময়কে দিয়ে করাতে পছন্দ করে। কারণ তন্ময় একজন ছেলে।

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া জানায় যে তাঁর বাড়ির মানুষদের মানসিকতা অন্যরকম। যেমন তাঁর কাকিমা ব্যাঙ্কে চাকরি করে। কিন্তু প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট তিনিই তৈরি করেন। তাঁর কাকা ও কাকিমা সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে প্রায়ই একসঙ্গে ফেরে। কিন্তু চা, জলখাবার প্রভৃতি তৈরির দায়িত্ব থাকে তাঁর কাকিমার উপর। অর্থাৎ প্রায় একই পরিশ্রমের কাজ নারী ও পুরুষ উভয়ে করলেও এবং উভয়েই চাকুরীজীবি হলেও 'বাড়ির কাজ নারীর' – এই ধারণা যেন তাঁদের বাড়িতে প্রচলিত ছিল।

এই উপন্যাসে বর্ণিত মিঠুর পরিবার তুলনায় উদার মানসিকতার ছিল। তাঁর বাবা ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং তাঁর মা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বিবাহের সময় তাঁর মা নিজের ধর্মমত পরিবর্তন করেননি। এই উপন্যাসে ইমন জানায় যে মিঠুর বাবার মতো উদার এবং ধর্মের সম্পূর্ণ উরদ্ধে থাকা মানুষ বিরল। মিঠুর বাড়িতে ঋতুর মতো একগুঁয়ে, খামখেয়ালি ও রূঢ় চরিত্রের বান্ধবী, ইমনের মতো সরল ও আত্মপ্রত্যয়ী বান্ধবী–সকলে সাবলীল ভাবে থাকতে পারে তাঁদের পরিবারের সকলের উদার মানসিকতা এবং উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য। বাস্তব জীবনেও মিঠুর পরিবারের মতো উদার মানসিকতার পরিবার খুব কম দেখা যায়।

এই উপন্যাসে বর্ণিত ঋতু খামখেয়ালি ও রূঢ় চরিত্রের। সে তাঁর নিজের বাবা-মা ও দিদিকে প্রতিনিয়ত অসম্মান করে। নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলতে সে ভালোবাসে। কিন্তু তাঁর চলার পথটা সঠিক নয়। তাঁর মধ্যে কামনা-বাসনা অস্বাভাবিক তীব্র। এমনকি এই জন্য সে নিজের বাবা-মা কে মিথ্যা কথা বলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়। পড়াশোনায় তাঁর আগ্রহ ছাত্র-ছাত্রী সুলভ নয়। তাই শেষপর্যন্ত সে তাঁর উচিৎ শিক্ষা পেয়েছিল এবং তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। সে তাঁর অনার্স টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এই ধরণের ঘটনা অনেক সময় বাস্তব জীবনেও দেখা যায়। কোন কোন শিক্ষার্থী কলেজে পড়ার সময় পড়াশোনায় সঠিকভাবে মনোযোগী না হয়ে তাৎক্ষণিক চাওয়া-পাওয়া মেটাতে ব্যস্ত হয়। তাঁদের জীবনের পরিণতিও কখনও ভালো হতে পারে না – এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখিকা সেই সত্যও যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে আরও একজন কলেজ-ছাত্রী উজ্জয়িনী বেশ অহংকারী। তাঁর বাবা একজন নামকরা বিত্তশালী ডাক্তার। কিন্তু তিনি প্রচন্ড রুক্ষভাষী, মেজাজী ও বদরাগী। তাঁর বাবা ও মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই। তাঁর বাবা অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত। উজ্জয়িনী যখন তাঁর মাকে জানায় তাঁর বাবাকে ডিভোর্স দিতে, তখন সে জানতে পারে যে তাঁর জন্মদাত্রী মা তাঁকে প্রসবের সময়ই মারা গিয়েছিলেন। তখন উজ্জয়িনীর জীবনে সব থেকেও কিছুই নেই বলে তাঁর মনে হয়। বাস্তব জীবনেও অনেক সময় দেখা যায় যে বাবা ও মায়ের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব সন্তানদের জীবনকে দুর্বিষহ করে দেয় – এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখিকা যেন এই সত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে ছাত্রীদের কলেজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। রাজেশ্বরী ও উজ্জয়িনী – এই দুইজন ছাত্রীকে কলেজের দুটি ছাত্র সংগঠন - এস এফ আই এবং ছাত্র পরিষদ তাঁদের নিজ নিজ প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করতে চেয়েছিল। কারণ দুটি ছাত্র সংগঠন মনে করেছিল যে রাজেশ্বরী ও উজ্জয়িনী ছাত্র সমাজে বেশ জনপ্রিয়, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। শেষপর্যন্ত রাজেশ্বরী এস এফ আই-এর প্রার্থী হিসাবে এবং উজ্জয়িনী ছাত্র পরিষদের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছিল। নির্বাচনে উভয়েই তাদের সহপাঠীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হলে দেখা যায় যে উজ্জয়িনীকে পরাজিত করে রাজেশ্বরী নির্বাচিত হয়। এরপর রাজেশ্বরীকে ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন কাজে যুক্ত হতে হয়। ফলে দেখা যায় যে তাঁর পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়। এই ঘটনা তুলে ধরে লেখিকা বাস্তব জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং তার পরিণতিই যেন তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসে শেষে দেখা যায় যে সব ছাত্রী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন ইমন কিম্বা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক দিশা পেয়েছে, যেমন অনুকা ও মিঠু। আর যারা পড়াশোনাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাৎক্ষণিক কামনা-বাসনা পূরণ করতে চেয়েছে, তাঁরা জীবনে কোন সঠিক দিশা পায়নি, যেমন ঋতু।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাণী বসুর আরও একটি অসাধারণ উপন্যাস অমৃতা।[১৬] এখানে নারীদের শিক্ষা, বিশেষত বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শিক্ষা আলোচিত হয়েছে। অমৃতা এবং তাঁর বন্ধুদের বিবাহ, জীবনের নানা টানাপোড়েন, বাঁচার লড়াই প্রভৃতি দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে অমৃতা নামে একটি মেয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর বাবা একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সে তাঁর বাবা-মায়ের খুবই আদরের একমাত্র সন্তান। তাঁর মা অনেকদিন ধরেই অসুস্থ। তাই বাড়ির অনেক কাজ তাঁকে করতে হত। তাঁর মা চেয়েছিলেন অমৃতাকে বিয়ে দিয়ে দিতে। কিন্তু তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে আরও পড়াশোনা করাতে। অমৃতাও চেয়েছিল পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। কিন্তু তাঁর বিয়ে নিয়ে তাঁর বাবা ও মায়ের মধ্যে অশান্তি দূর করতে শেষপর্যন্ত সে বিয়ে করতে রাজী হয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর স্বামী হবেন একজন অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর বিয়ে ঠিক হয় একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। তাঁর শ্বশুর একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, শাশুড়ি শিক্ষিকা ও ননদ বিবাহিত।

বিয়ের কথা আলোচনার সময় তাঁর হবু শ্বশুর ও শাশুড়ী বিয়ের পর অমৃতার ভালো থাকার কথা অনেক বাড়িয়েই বলেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর অমৃতা তাঁর শ্বশুরবাড়ির প্রকৃত চিত্র দেখতে পেল। তাঁর বিয়ের পর তাঁর শ্বশুরবাড়ির একটি কাজের লোক ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁকেই ঘর-বাড়ি পরিস্কার করতে হত। সকাল সাড়ে ছয়টার আগে তাঁর শিক্ষিকা-শাশুড়ীর চা ও জলখাবার তাঁকে তৈরি করতে হত। এরপর স্নান করে সমস্ত রান্না করে সকাল ঠিক নয়টায় তাঁর স্বামীকে খেতে দিতে হত। তারপর তিন-চারটে ক্যাসরোলে খাবার ঠিক করে রেখে, রান্নাঘর মুছে কোনক্রমে কয়েকদলা ভাত গলার মধ্যে পাঠিয়ে অমৃতা ছুটত ইউনিভার্সিটিতে। এরপর বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যা ছয়টায় সকলের জন্য চা করতে হত। আবার রাতের জন্য রুটি-তরকারি করতে হত। নিজে রান্না করলেও সবচেয়ে ছোট মাছটা তাঁকে খেতে হত। সবার জন্য ডিম রান্না হলেও অনেক সময় সে নিজে ডিম পেত না। এই সব দিকে তাঁর স্বামীর কোন নজর ছিল না।

বাড়ির সমস্ত কাজ সেরে অমৃতা প্রায় দিনই ইউনিভার্সিটিতে দেরি করে পৌঁছাত। তাই তাঁদের জয়িতা ম্যাডাম জানান যে ভালো মেয়েদের পড়াশোনার এই অবস্থা ম্যাডামের ভালো লাগে না।[১৭] কিন্তু তাঁর মনের কথা ম্যাডামকে বলতে পারে না।

এই উপন্যাসে একদিন যখন জানা যায় যে অমৃতা সন্তানসম্ভাবা, তখন তাঁর স্বামী অরিসূদনসহ তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলে সেই ভ্রূণটা নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কারণ অমৃতা সন্তানসম্ভাবা হলে সে বাড়ির কাজ বেশ কিছুদিন করতে পারবে না। কিন্তু অমৃতা চেয়েছিল তাঁর প্রথম সন্তান এই পৃথিবীর আলো দেখুক। শেষপর্যন্ত এক মানবিক ডাক্তার, রঞ্জন কার্লেকর, অমৃতার পাশে থেকে অনেক ঝুকি নিয়ে অমৃতাকে গোপনে এক নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা জয়িতা বাগচি তাঁর ছাত্রীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি নিজে জানিয়েছিলেন তাঁর স্বামী চাননি বলে তাঁকেও তাঁর দ্বিতীয় সন্তানকে গর্ভে নষ্ট করতে হয়েছে।[১৮] অর্থাৎ লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাকেও তাঁর স্বামীর (যিনি একজন কলেজের অধ্যাপক) দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে হত। আমাদের বাস্তব জীবনেও এই রকম দৃষ্টান্ত খুব কম নয়। আবার অনেক ঘটনা প্রচারের আলোয় আসে না।

শেষপর্যন্ত রেজাল্ট বার হলে দেখা যায় যে অমৃতা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। অর্থাৎ লেখিকা দেখিয়েছেন অসীম মনের জোর, নিরলস প্রচেষ্টা এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোন নারী তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে দোলার মতো মেয়ে, যে পড়াশোনাকে কম গুরুত্ব দিয়ে জীবনের তাৎক্ষণিক কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দিয়েছিল, তাঁকে শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা করতে হয়েছিল।

আবার সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *জলছবি* এই প্রসঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।[১৯] এখানে লেখিকা দেখানোর চেষ্টা করেছেন কলেজ জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, শিক্ষকের প্রতি ছাত্র ইউনিয়নের অসম্মানজনক আচরণ প্রভৃতি। অনেক ছাত্রীও ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতার মোহে অধ্যাপকদের অপমান করতেও দ্বিধাবোধ করে না।[২০] বাস্তব জীবনেও অনেক সময় এই ধরণের পরিস্থিতি দেখা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে কলেজের অধ্যাপক সোমনাথবাবুর ছোট মেয়ে সুকন্যা মুখারজী (মিতুল) স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে। স্কুলটি তাঁদের বাড়ির থেকে অনেক দূরে বলে মিতুলের বাবা ও মা ঐ স্কুলে তাঁকে যোগ দিতে নিষেধ করে। কিন্তু মিতুল তাঁর জীবনের প্রথম চাকরিতে যোগ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাঁর মা জানায় যে এবার তাঁর বিয়ে দেবেন। তারপর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কথা বলে সে চাকরির বিষয়ে সবকিছু ঠিক করবে।[২০] অর্থাৎ লেখিকা এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে কোন মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে একজন শিক্ষিকা হিসাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার বিবাহ এবং বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ির মত অনুযায়ী সব কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই স্কুলে যোগ দিতে এসে মিতুল দেখে বাস্তবে স্কুলের অস্তিত্বই নেই। তবে শেষপর্যন্ত মিতুল এবং বড় দিদিমণিসহ[২১] সকল শিক্ষিকার চেষ্টায় অন্য একটি স্কুলের দুটি ঘর নিয়ে তাঁদের মাটিকুমড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়। অর্থাৎ লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আন্তরিকতা ও সৎ সাহস থাকলে যে কোন শুভ কাজ করা সম্ভব বা শুভ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

উপন্যাসের শেষদিকে দেখা যায় যে কোন ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে চাওয়া অধ্যাপক সোমনাথ মুখারজী ছাত্র ইউনিয়নের এক ছাত্রনেতার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এই সাহসের প্রেরণা হয়তো তাঁর কন্যা মিতুল। অর্থাৎ লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন যে দীর্ঘদিন একটি কলেজে অধ্যাপনা করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পিতার দৃষ্টিভঙ্গিকেও পরিবর্তন করে দিতে পারে তাঁর শিক্ষিত ও শিক্ষিকা হিসাবে সদ্য স্কুলে যোগ দেওয়া তাঁর কন্যা।

এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার বিভিন্ন দিক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কর্মজীবনে প্রবেশ করে কি ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন নারীদের হতে হয়, তাও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারি পরিসংখান থেকে জানা যায় যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় নারীদের শিক্ষার্থী হিসাবে এবং শিক্ষিকা হিসাবে অংশগ্রহণ বেড়েছে। সরকারি রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১০-২০১১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে মোট নারী শিক্ষার্থী ছিল ৪২৩,২৭০ জন এবং সময়ে পুরুষ শিক্ষার্থী ছিল ৬৪২,৮৭৮ জন।[২২] ঐ সময়ে পোস্টগ্রাজুয়েট লেভেলে মোট নারী শিক্ষার্থী ছিল ৪৩,০৫৯ জন এবং পুরুষ শিক্ষার্থী ছিল ৫২,০৩৮ জন।[২৩] অর্থাৎ উল্লেখিত সাহিত্যগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, সরকারি নথীগুলিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে এ কথাও বলা হয়েছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বাড়লেও কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামাঞ্চলে এবং মফঃসল এলাকায় নারীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নারীদের শিক্ষালাভকালে এবং পরবর্তীকালে গৃহজীবনে ও কর্মজীবনে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়। আর নারীরা যদি তার পরিবার, অভিভাবক, স্বামী, সর্বোপরি সমাজের সাহায্য পায়, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় এবং তারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষা প্রসারে ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ভূমিকা নিতে পারে।

Reference:

১. রাসসুন্দরী, শ্রীমতী, *আমার জীবন,* ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* শনিবার, ১১ই মে, ২০১৯, পৃ. ২
৬. পূর্বোক্ত
৭. পূর্বোক্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 87
Website: https://tirj.org.in, Page No. 786 - 792
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. পূর্বোক্ত
৯. Mallik, P.C., *Fact Books on Education, An Introduction*, State Planning Board, Government of West Bengal, 30th April, 1977, p. 29
১০. বসু, ঋতা, *শ্রীসদনের শ্রীমতীরা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
১৩. বসু, বাণী, *একুশে পা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, চতুর্দশ মুদ্রণ ২০১৮
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
১৬. বসু, বাণী, *অমৃতা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৬
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
১৯. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *জলছবি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৭
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
২২. *Annual Report of the Department of Higher Education, 2010-2011*, Department of Higher Education, Government of West Bengal, 2011, p. 8
২৩. পূর্বোক্ত